অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

অনাবৃতা

জতুর আজও ঘুম ভেঙে গেল। কোথাও থেকে চাপা কান্নার আওয়াজ—কেউ কাঁদছে। মাথার দিকের জানালা খোলা। গন্ধরাজ লেবুর পাতা ডাল হাওয়ায় দুলছে। তার কেমন ভয় করছিল।

পাশের খাটে মা শুয়ে আছেন।

মা বোধহয় ঠিকই টের পান।

কী হল জতু? ঘুমিয়ে পড়। ও কিছু না।

কেমন ভূতুড়ে মনে হয়, মা কি বোঝেন, জতু ঠিক টের পেয়ে গেছে মধ্য রাতে কেউ কাঁদে। মা কি চান না, জতু জেগে থাক, বিছানায় উঠে বসুক, ভয়ের কী আছে, দুপুর রাতে কেউ কান্নাকাটি করলে কী করা! তোর না ঘুমানোর কী আছে বুঝি না। মা এমন ভাবতেই পারেন।

জতু তার মায়ের সঙ্গে পুবের ঘরে থাকে। বাবা প্রবাস থেকে এলে এই ঘরে থাকেন। জেঠিমা কাকিমাদের আলাদা ঘর। উঠোনের চার ভিটিতে চারটি আটচালা। দক্ষিণের ঘরে আত্মীয়-কুটুম এলে থাকেন। মাষ্টারমশাই আর নিমাইদা রাতে আত্মীয়-কুটুম না এলে ও ঘরটায় থাকে। উত্তরের ঘরে ঠাকুরমা ঠাকুরদা, বিশাল বাড়িতে এদিক ওদিক মেলা শরিক, গোয়ালবাড়ি, রান্নাবাড়ি-অন্দরে পুকুরও আছে একটা। বড়ো একটা তেঁতুলগাছ আছে ঘাটে। বৃষ্টি হলে ঘরবাড়ির জল গাছটার শেকড়বাকড় পার হয়ে পুকুরে গিয়ে নামে। কতকাল থেকে বর্ষায় এই জল নামছে জতু ঠিক জানে না। গাছটার শেকড়বাকড় আলগা, বর্ষার মাটি ধুয়ে নিলে শেকড়বাকড় আলগা হবারই কথা। এত বড়ো গাছ, আর তার কুমিরের মতে শেকড়বাকড় এলোমেলোভাবে জড়িয়ে আছে বলে, সকালে ঘাটে গেলে জতুর দাঁড়িয়ে থাকতে কিংবা বসে থাকতে অসুবিধা হয় না। গাছের শিকড়বাকড়ে উঠে বসে থাকে। বউটি জলে নামে, সে দেখে। জলে ডুব দেয় সে দেখে। সে না বললে বউটি জল থেকেও উঠে আসতে পারে না।

কেন যে মা সকালেই তাকে ডেকে দেন, ও জতু ওঠ। কমলবউ উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে। ওঠ বাবা। সঙ্গে যা। তুই না গেলে পুকুরে ডুব দিয়েও শান্তি পাবে না।

জতুর উঠতে ইচ্ছে হয় না। মাঝরাতের চাপা কান্নার তার মগজ গরম হরে থাকে। শীতল হতে সময় নেয়। ভোররাতের দিকেই প্রগাঢ় ঘুম চোখে। মা ডাকাডাকি করলে, চোখ মেলতে তার কিছুতেই ইচ্ছে হয় না।

সে এক রাতে ঘুম থেকে উঠে বসেছিল।

কেউ কাঁদছে ফুঁপিয়ে।

সে বলেছিল, মা তুমি কিছু শুনতে পাও না।

কী শুনতে পাব?

বারে, শুনতে পাচ্ছ না?

মা কেমন অস্বস্তিতে পড়ে যান। খাট থেকে নেমে মাথার জানলা বন্ধ করে দেন। মাথার জানলা বন্ধ করে দিলে হাওয়া ঢোকে না। গরমে খুব কষ্ট হয় জতুর। ঘরে হ্যারিকেন জ্বলে। মা যে কেন জানলাটা বন্ধ করে দিলেন। সে হাঁসফাঁস করতে থাকে। তবে জানলা বন্ধ করে দিলে চাপা কান্নার আওয়াজ থাকে না। অবশ্য গাছে একটা প্যাঁচা ডাকছিল। রান্নাবাড়ির দিকটায় প্যাঁচাটা থাকে। জামগাছের মাথায় এক জোড়া প্যাঁচা কবে থেকেই আছে।

আরও শব্দমালা সে শুনতে পায়। কীটপতঙ্গের আওয়াজ তো আছেই। রাতে পাখিরা বিল থেকে উড়ে যায়—তার পাখার শব্দ এবং ভরা বর্ষার সময় বলে চারপাশের জলমগ্ন জায়গায় শাপলা শালুকের সবুজ পাতায় টিট্রিভ পাখিদের বিচরণ—তার কলরবও কানে

আসে। বাড়ির দক্ষিণে সদর পুকুর, চারপাশে চালতাগাছের ছায়া। দুটো খেজুরগাছ এবং ছোটো বিশাল শিমূল গাছও আছে। বাড়ির পিছনে মোত্রাঘাসের জঙ্গল। ডাহুক পাখিরাও গভীর রাতে মারামারি শুরু করে দিলে কোলাহল ওঠে। বর্ষায় জলে জঙ্গলে দেশটা ভেসে থাকে।

মা বললেন, তুই শুয়ে পড় জতু। বসে থাকলি কেন? গরম লাগছে। জানলাটা খুলে দি। তুমি জানলা বন্ধ করলে কেন?

জতু তুই বড়ো জ্বালাস!

জতু মার জন্য অপেক্ষা না করে, নিজেই জানলাটা খুলে দিল। কান্না আর শোনা যাচ্ছে না। পাশের বাড়িটা যতীন দাসের। দেখতে কদাকার মানুষটি কুশঘাটে শাড়ি বিক্রি করতে যায়। ঘরে দুটো তাঁত, দুজন তাঁতি, সকাল বিকাল চরকার ববিনে সুতো পরানো হয়, তানা। হয়, মাকুর খটাখট শব্দে কান পাতা যায় না। কমলবউ নিজেও তাঁত বুনতে পারে। মিষ্টি সুন্দর মতো বউটাকে যতীন দাস গেল বছর বিয়ে করে এনেছে। আগের পক্ষের বউটি আত্মহত্যা করায় যতীন দাসের বিয়ে না করেও উপায় ছিল না।

নে শুয়ে পড় জতু।

জতু জানে শুয়ে পড়লেই তার ঘুম আসবে না। ঘুম এলেও মা-ই আবার তাকে জাগিয়ে দেবেন ওঠ জতু। যা উঠোনে কমলবউ দাঁড়িয়ে আছে।

এত সকালে সে না উঠলে কমলবউ উঠোন থেকে নড়বে না। মাকে জ্বালাবে। পাড়াপড়শিরা জেগে যাবার আগে পুকুরঘাটে তার সঙ্গে যেতে হবে।

রোজ কাঁহাতক ভালো লাগে। তার উঠতে ইচ্ছে হয় না। কিন্তু বউটি যে তার প্রায় সমবয়সি, সমবয়সি না হোক, কিছু বড়ো হলেও ক্ষতি নেই। জতু ক্লাস এইটে পড়ে। তার দাদারা কলেজে পড়ে। তিন ক্রোশ সাইকেল চালিয়ে দাদারা কলেজ যায়। দত্তদের বাড়ি বললে এ-অঞ্চলে সবাই এক ডাকে চেনে। তার জ্যাঠামশাই ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। বাড়ির বাইরে একটা নীল রঙের ডাকবাক্সও আছে।

তাছাড়া বাড়িটা তাদের খুবই ছিমছাম। দক্ষিণের ঘর পার হলেই বাইরের উঠোন, বিকেলে সেও দাদাদের সঙ্গে নেট টানিয়ে ব্যাডমিন্টন খেলে। জ্যাঠামশাই ঘোড়ায় চড়ে তখন রোগীর বাড়ি থেকে ফেরেন। জ্যাঠামশায়ের ডিসপেনসারি ঘরের মেঝে শান বাঁধানো। বড়ো বড়ো বয়েম। উদখল আরও বড়ো। নিমাইদা এ-বাড়িতে এসেছে কবিরাজি শিখতে। দেশ ভাগ হয়ে যাওয়ায় বন্যার জলের মতো রিফুজিতে ভেসে যাচ্ছে দেশটা। কমলবউ রিফুজি মেয়ে সে জানে। ভালো নাম কমললতা। নাকে নথ করিয়ে দিয়েই যতীন দাস তাকে বাড়িতে তুলে এনেছে।

একদিন রাতে জতুর কী হল সে জানে না। চুপি চুপি দরজা খুলে বের হয়ে দেখল, বাগানের দিকটায় কেউ জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে আছে। এত রাতে মানুষ বাইরে থাকলে চোর ডাকাত ভাবাই যায়। কিন্তু সে দেখল, লোকটা বাগানের গাছ থেকে ফুল তুলছে। ঠিক নিমাইদা, নিমাইদা এত রাতে বাগানে ঢুকে কী ফুল তুলছে সে জানে না। তবে জ্যোৎস্নায় নিমাইদা গাছ লতা পাতা ফুল ভালো চেনে, সে এটা জানে।

বাড়িতে কবিরাজি ওষুধে লাগে। এমন অনেক গুল্মলতাই ঠাকুরদার আমল থেকে বড়ো হয়ে উঠেছে। বাড়ির এই বাগানটায় একটি দারুচিনি এবং এলাচের গাছও আছে। তেজপাতার লতাও আপন মহিমায় নিজের মতো একটি কয়েদবেল। গাছ জড়িয়ে বেঁচে আছে।

নিমাইদাকে রাতে উঠতে হয়, কারণ রাত থাকতেই কাজকাম শুরু হয়ে যায়। গাছ থেকে পাতা, ফুল এবং শেকড়বাকড় তুলে পুকুরঘাটে ধুয়ে তারপর শান বাঁধানো বারান্দায় ছড়িয়ে রাখতে হয়। জ্যেঠামশাইয়ের নির্দেশ মতোই সে কাজ করে থাকে। রাত থাকতে তুলে না নিতে পারলে, জীবনদায়ী ওষুধ বোধ হয় তৈরি করা যায় না। শেকড়বাকড়ে, পাতায় এবং ফুলে সকালের রোদ না খাওয়ালে চলে না।

তারপরই মনে হল সে উঠোনে নেমে এসেছিল, সেই এক কুহকে। চাপা কান্নার উৎস খুঁজতে বের হয়েছে, তার মনে পড়ে গেল। তবে নিমাইদা বাগানে ঘোরাঘুরি করায়

বুঝতে অসুবিধা থাকল না, রাত আর বেশি নেই। রাতে চাপা কান্না শুনলে কার না অস্বস্তি হয়।

তার মতো সবারই অস্বস্তি হতে পারে। কিন্তু কেউ কিছু বলে না। অথবা কারও কোনও কৌতূহলও নেই। কিংবা সে এবং তার মা ছাড়া রাতের এই অস্বস্তি এত বেশি বোধ হয় কেউ টের পায় না। কারণ যতীন দাসের ঘরটি ডেফল গাছটা পার হয়ে গেলেই। বড়ো সংলগ্ন ঘর। ঘরে যতীন দাস আর কমললতা রাতে শোয়। তারপর আরও ঘর আছে যতীন দাসের। তাঁত, তানা সুতোর ডাঁই ঘরগুলোতে। দক্ষিণের দিকে সুপারি বাগান, পিছনের দিকে বেতের জঙ্গল এবং একটা বিশাল গাবগাছ। তারপরই বুক সমান বর্ষার জল—যত দূর চোখ যায়।

শেষ রাতের জ্যোৎস্নায় জতু এত গাছপালা এবং ঘরবাড়ির মধ্যে হেঁটে বেড়ালে শুনতে পায় ঠাকুরদা কাশছেন। আর কোনও আওয়াজ নেই। নিমাইদা বাগান থেকে ঝুড়ি নিয়ে বের হয়ে গেল। সদর পুকুরের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। যতীন দাসের লেবুর ঝোপে জোনাকি ওড়াওড়ি করছে। কিন্তু কোনও চাপা কান্নার আওয়াজ নেই।

সে হয়তো ভুল শোনে।

সে আবার সতর্ক পায়ে দরজা ঠেলে ঘরে ঢোকে এবং দরজা বন্ধ করে দেয়। খাটে উঠে শুয়ে পড়ে। পাশ ফিরে শোয় না। চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে। কান খাড়া করে রাখে। তার ঘুম আসে না।

সকালে সে আজ নিজেই উঠে পড়ল। দরজা খুলে দেখল কমললতা দাঁড়িয়ে আছে। একটা ডুরে শাড়ি পরনে। হাতে পেতলের একটা ঘটি। তাকে বের হতে দেখেই অন্দরের পুকুরের দিকে হাঁটা দিল কমল। অলগাভাবে হাঁটছে যেন সে এখন যেখানে পা রাখবে সবই অসুবিধে হয়ে যাবে। কমল তাকে ছুঁয়ে দিলেও জতুর যেন জাত যাবে।

জতু জানে তার কাজটা কী। বউটি পুকুরের জলে ডুব দেবে। গভীর জলে ডুব দিয়ে ভেসে উঠবে। বলবে, জতু আমার কিছু ভেসে ছিল না তো। ঠিক ডুবে গেছি তো।

কিছু তো ভেসে থাকে। যেমন শাড়ির আঁচল, অথবা চুল, এত ঘন লম্বা চুল খোঁপা না ডুবে গেলে হয় না। আবার ডুব।

জতু আগে বেশ মজা পেত এই নিয়ে।

না ডোবেনি।

কী ডোবেনি।

তোমার ঘোমটা।

কমলবউ ঘোমটা খুলে শাড়িটা দুহাতে জড়িয়ে ডুব দিলে, কিছুই ভেসে থাকে না। একেবারে যতটা পারা যায় নীচে কাঁকড়ার মতো বিচরণ করতে থাকে। চোখ লাল, এতক্ষণ শ্বাস বন্ধ করে থাকাও কঠিন। কিছু ভেসে থাকার আতঙ্কে জলের নীচ থেকে উঠেই আসতে চায় না।

জতু না বললে, কমল জল থেকেও উঠে আসত না।

এই এক খেলা যে জতুকে ক্রমে আকৃষ্ট করে তুলেছে। বউটি জলে নেমে যায়, শাড়ি ভিজতে থাকে, কোমর জলে নেমে শাড়ি দু-হাতে বুকে জড়িয়ে রাখে, তারপর খোঁপা খুলে চুল ছড়িয়ে দেয়। খোঁপা বাঁধা থাকলে, জলে সব চুল ভেজে না, রাতে অশুচি হয়ে থাকে শরীর। জলের নীচে ডুব দিলে কমল, পুণ্যতীর্থ গয়া গঙ্গা আছে টের পায়। না হল না চুলের ডগা ডোবেনি।

কমল পড়ে যায় মহাবিভ্রাটে। তার কেবল মনে হয় বারবার ডুব দিয়েও সে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধুয়ে সাফ করতে পারেনি।

আবার ডুব?

কীরে জতু কী হল!

আঁচল ভেসে আছে।

কমল নিজের মধ্যে বোধ হয় থাকে না। সে তার সায়া শাড়ি খুলে সব বুকের মধ্যে জড়িয়ে ডুব দেয়। সেমিজটিও খুলে ফেলে। কীভাবে যে শাড়ি সায়াতে বাতাস ঢুকে থাকে এবং ডুব দিলেও শাড়িসায়া ভেসে ওঠে জলে। জতু কমলকে শুধু দেখে।

কখনও মনে হয় মাছের মতো পাখনা মেলে দিয়েছে জলে। অন্দরের পুকুর, তায় বর্ষাকাল, জল টলমল হয়ে আছে, জলের নীচে নুড়ি পাথর পর্যন্ত স্পষ্ট। স্ফটিক জলে কমল নেমে গেলে সবই দেখতে পায়। সুন্দর শরীর এবং স্তন, সবই অবাধে কমল জলের নীচে নগ্ন সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পারে।

জতু হাঁটছে।

কমল হাঁটছে।

ঘুম থেকে কেউ ওঠেনি। কিছুটা অন্ধকার মতো হয়ে আছে—সূর্য উঠলেই এই অন্ধকার কেটে যাবে। কমল তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে হাঁটছে। ইঁদারা পার হয়ে, বাড়ির পাঁচিল বাঁশঝাড় পার হয়ে কমল পিছন ফিরে তাকাল।

এই আয়।

যাচ্ছি তো।

কমল ঘাটে এসেই এক কাণ্ড করে বসল আজ। চারপাশে সতর্ক নজর তার। পুকুরের পাড়ে সব আম জাম নারকেল গাছ। তারপর বিশাল জলাভূমি যতদূর চোখ যায়। অন্দরের পুকুরে পুরুষমানুষদের আসার নিয়ম নেই। জতু পুরুষমানুষ কি না সন্দেহ আছে এখনও। ক্লাস এইটে পড়লে পুরুষমানুষ হওয়া যায় না। অন্দর সদর সব সমান তার কাছে। কমল এটা ভালো করে জানে বলেই সেজমামিকে বলে জতুকে সহজেই বিছানা থেকে তুলে আনতে পারে। জলের নীচে ডুবে গেছে কি ডোবেনি কেউ বলে না দিলে তার জলে ডুবে তৃপ্তি হয় না।

জতু দেখছে, আবার থুতু ফেলছে কমল।

সে ডাকে, কমলবউ।

আমাকে কিছু বলবি।

কমলবউ তুমি এত থুতু ছিটাও কেন?

কমলবউ বলল, শরীর। শরীর কী আগে বুঝতে শেখ। শরীরে যে বিষ আছে। জতু দেখেছে, কমলবউ সারাক্ষণ থুতু ফেলে। উঠোনে দাঁড়িয়ে ছিত করে থুতু ফেলার অভ্যাস। হাঁটার সময়ও। মুখে এত থুতু জমে কী করে। সকালে পুকুরে ডুব দিতে যাবার আগে এটা তার হয়। জতু কিছুটা বোকার মতো তাকিয়ে থাকে কমলের দিকে। শরীরে এত বিষ, কেন হয়, বিষের কি মা বাপ নেই, কিংবা ঘৃণা কখনও মানুষের মধ্যে জেগে গেলে থুতু জমে উঠতে পারে মুখে। জতু অবশ্য থুতু মাড়িয়ে হাঁটে না। হাঁটার নিয়ম নেই। কমল ঠিক মনে রাখতে পারে কোথায় কখন সে থুতু ছড়িয়েছে। পুকুর থেকে পবিত্র হয়ে ফেরার সময় ঘটির জল ছিটিয়ে বসুন্ধরাকেও পবিত্র করে নেয়। সে দেখেছে, ঠিক যেখানে কমল আসার রাস্তায় থুতু ছিটিয়েছে—ঠিক সেসব জায়গায় জল ছিটিয়ে চলে যাচ্ছে। থুতুতে পা পড়ে গেলে কমল বোঝে। এই এত আতঙ্ক থেকে জতু, কমল যে রাস্তায় হাঁটে, তার থেকে কিছুটা আলগা হয়ে হাঁটে।

মা একদিন জতুকে কেন যে বলেছিল, তোমার এখানে কী? যাও।

কমলবউ বসে আছে মেঝেতে। ঠাকুমা মা জ্যেঠিমা সবাই ঘাটে বসে আছেন। কমলবউ পিঠের শাড়ি সরিয়ে ওঁদের কী দেখাচ্ছিল।

সে ঘর থেকে বের হয়ে গেছিল ঠিক, তবে কাছাকাছি এবং জানলার পাশে দাঁড়িয়েছিল।

আমাকে মারে।

ঠাকুমা বললেন, মারবে না, সোহাগ করবে। তুই কম যাস না। পুরুষমানুষ সারাদিন খাটাখাটনি করে, তার আর আছেটা কী! গোয়ার্তুমি করলে চলে।

আমার যে ইচ্ছে করে না ঠাইনদি।

মেয়েমানুষের আবার ইচ্ছে কী! তোর মুখে খেতা পুড়ি।

মা বলেছিলেন, তাই বলে মারধর করবে!

করবে না। মাথা না পাতলে সে বেচারাই বা যায় কোথায়?

জতুর কষ্ট সেই থেকে। যতীন দাদা মানুষ তো খারাপ না। তবে বেঁটে, বেঢপ, দেখতে আবলুস কাঠের মতো রং। চোখ দুটো চামড়ার ভাঁজে দেখা যায় কী যায় না। ব্যাঙের মতো নাকটা সায়া মুখ জুড়ে বসে আছে। কানে বড়ো বড়ো লোম, নাকের ভিতরে থেকে লম্বা গোঁফ এবং বিসদৃশ্য এই চেহারা কমলবউয়ের খারাপ লাগতেই পারে।

শেষে জ্যাঠামশায়ের কানেও কথাটা উঠেছিল।

সেদিন জ্যাঠামশাই সবে রোগীর বাড়ি থেকে ফিরে এসেছেন। জনার্দন কাকা তাঁর ঘোড়া নিয়ে আস্তাবলে বেঁধে দিচ্ছে। তিনি স্নানটান সেরে বৈঠখখানায় বসে নিমাইদাকে ডেকে কী একটা ফর্দ ধরিয়ে দিয়েছেন। বাসলেহর ওষুধের দরকার। বর্ষাকাল, সর্দিজ্বরের প্রকোপ বেড়েছে, ওষুধটি না হলে চলে না। তখনই বাবা গিয়ে নালিশ দিলেন, আর তো ও ঘরে থাকা যাচ্ছে না।

কেন রে?

যতীন বউটাকে রাতে মারে।

মারে কেন?

সে আমি কী করে জানব।

তারপর কেন যে তিনি কী বলেছিলেন, কারণ না থাকলে কেউ মারে!

একবার জিজ্ঞেস করুন ডেকে।

জ্যাঠামশাই হেসে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তুমি বোঝ না, কেন মারধর করে? যতীন তো আর অমানুষ নয়। মাথায় তার রক্ত উঠে যায় কেন? তুমি হলে কী করতে।

বাবা আর কোনও কথা না বলে যেন পালাতে পারলে বাঁচেন।

জতু ঠিক বোঝে না সব কিছু। তবু সে জানে সারারাত কমলবউকে যতীন দাদা ঠ্যাঙায়। এমন সুন্দর মেয়েটা, বালিকা স্বভাবের, তার মুখে থুতু উঠলে যে কিছু না কিছু গর্হিত কাজ হয়ে থাকে বুঝতে তার কষ্ট হয় না। কমলবউ ডাকলেই সে সাড়া না দিয়ে পারে না।

এমনকী জলে ডুবিয়ে, বার বার ডুবিয়ে, না হল না, আবার ডুব দাও, হল না, ভেসে উঠলে কেন, পায়ের পাতা ভেসেছিল, না হল না, তোমার হাতের আঙুল জলের ওপরে থাকলে হবে কেন, নিশ্বাস বন্ধ করে, একেবারে তলিয়ে যেতে পার না, তোমার শরীরে শাড়ি আলগা হয়ে জলে ভেসে থাকে কেন, এভাবে অজস্র ডুব আর ডুব, বালিকা বউটির বয়সি স্বামীর তাড়া থেকে মুক্ত থাকার জন্য ডুব দিতে দিতে হাত পা অবশ হয়ে আসে। ঠোঁট সাদা হয়ে যায়। ঠান্ডায় থরথর করে কখনও কাঁপে।

জতুর কষ্ট হয়। মিছে কথাও বলতে পারে না। পাপ হবে। তাকে দিব্যি দিয়েছে, জতু, আমি ঠিক ডুবে না গেলে, কখনও বলবি না, ডুবে গেছি। বলবি না, আর জলে ডুব দিয়ে কাজ নেই। বললে, তোর পাপ হবে। মিছে কথা বললে, পাপ হয় জানিস!

জতু আজ আলগাভাবেই তেঁতুলগাছের শেকড়ে বসে পড়ল। কতক্ষণে জল থেকে উঠে আসবে কে জানে!

কিন্তু আজ এটা কী করল কমলবউ।

সে তাকাতে পারছে না।

কমলবউ আঁচল শরীর থেকে নামিয়ে দিল।

সেমিজ টেনে খুলে ফেলল শরীর থেকে। তারপর সায়ার ফসকা গেরো টেনে দিতেই, থর থর করে পড়ে গেল পায়ের কাছে। কমল বউ পা দিয়ে সায়াটা তুলে জলে ছুড়ে দিল। শাড়ি ব্লাউজ পা দিয়ে ঠেলে দিল জলে।

কোনও হুঁশ নেই কমলবউয়ের। হাঁসের মতো ঘাটলা থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ডুব দিল। কী একটা ঘোরের মধ্যে আছে যেন।

ডাকল, জতু ধর।

সে চোখ মেলে দেখছে, কমলবউ বুক জলে দাঁড়িয়ে সব সায়া শাড়ি সেমিজ ভালো করে জলে ডুবিয়ে ঢেউ দিচ্ছে জলে।

ধর, বসে আছিস কেন!

জলের নীচে মাছরাঙা পাখি হয়ে ঘোরাঘুরি করছে। এক অতীব আশ্চর্য শিহরণ খেলে গেল জতুর শরীরে।

কী, বসে আছিস কেন। এগুলো তুলে রাখ। জলে ভালো করে ডুবিয়ে দিয়েছি। এবং এমনভাবে জলের মধ্যে কমল ঢেউ খেলিয়ে ভাসিয়ে দিল কাপড় জামা যেন এ শাড়ি সেমিজের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই।

জতু অগত্যা কী করে। লাফ দিয়ে শেকড় থেকে নেমে ভেজা সায়া শাড়ি তুলে রাখল ঘাটলায়।

জতু দ্যাখ, আমি ঠিক ডুবে যাচ্ছি কি না।

কমলবউ ডুব দিল। জলের নাচে তার নগ্ন ফর্সা শরীর সাপের মতো কিলবিল করে এগিয়ে যাচ্ছে।

কমলবউ ডুব সাঁতারে-চিৎ সাঁতারে বড় পটু। তার হাত পা পিঠ দেখা যাচ্ছে। জলে ডুব দিচ্ছে, ভেসে উঠছে। সাঁতার কেটে মাঝপুকুরে চলে যাচ্ছে।

মাঝপুকুর থেকেই চিৎকার করছে, জতু আমি ঠিক ডুবে যাচ্ছি তো! হ্যাংলার মতো জতু চিৎকার করে উঠল, তুমি কোথায়?

ঠিক টের পেয়েছে কমলবউ, জতু ভয় পেয়ে গেছে।

আমি এখানে। বলে কচুরিপানার ভেতর থেকে ভুস করে ভেসে উঠল কমলবউ। কমলবউ তুমি মাঝপুকুরে চলে যাচ্ছ কেন! আর যেও না। ওদিকে বড়ো বড়ো কচুরিপানা, শ্যাওলা, আটকে গেলে ডুবে যাবে। দূরে নদীর জল, জোয়ার, সেখানে পড়ে গেলে ভেসে যাবে।

কমলবউ, ফের কচুরিপানার ভিতর থেকেই হাত তুলে বলল, আমি ঠিক ডুবে যাচ্ছি তো?

তুমি ফিরে এসো কমলবউ। আর যেয়ো না।

কমলবউয়ের আর সাড়া পাওয়া গেল না। কচুরিপানার ভিতর থেকে, হাতও তুলে দিল। কোমর সমান উঁচু কচুরিপানা পার হয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। সম্ভব হলেও পুকুরের শ্যাওলা-দামে কিংবা লতাগুলো আটকে যাবে। জলে ডুবে মরে যাবে। লাশ হয়ে ভেসে উঠবে। জতু যে কী করে! জতুর কান্না পাচ্ছিল।

পুকুরের ওপাড়ে যাবে তারও উপায় নেই। জল আর জল, গভীর জল—সামনে যত দূর চোখ যায় জলাভূমি নদী আর তার জলরাশি বেগে নেমে যাচ্ছে। ঘাটলায় শাড়ি সায়া সেমিজ পড়ে আছে—জতু কাউকে ডাকতেও পারছে না। কেবল মাঝে মাঝে চিৎকার করছে, কমলবউ আমার ভালো লাগছে না।

আমি চলে যাচ্ছি। পড়ে থাকল তোমার জামাকাপড়। কী আরম্ভ করলে!

জলের উপর দিয়ে দুটো ফড়িং উড়ে গেল। নিস্তরঙ্গ জলে ঢেউ উঠল। কিন্তু কমলবউ হাত তুলে, কিংবা ডুব সাঁতারে পায়ের কাছে এসে ভেসে উঠল না।

জতু ছুটছে। জতু চিৎকার করছে কমলবউ জলে ডুবে গেছে। যতীন দাস পাগলের মতো ছুটে বের হয়ে এল। মা জ্যেঠিরা সবাই। খবর ছড়িয়ে পড়লে পুকুর পাড়ে ভিড় বেড়ে গেল। কিন্তু এই জলা জায়গায় খুঁজে দেখাও অসম্ভব। কোথায় পড়ে আছে কে জানে! জলে নেমে গেল কেউ কেউ। কচুরিপানা টেনে তুলে দেখা হল, লগায় খুঁচিয়ে কিংবা জলে ডুবে যতটা পারা যায় তাও দেখা গেল।

মাস্টারমশাই শুধু বললেন, নিমাইকে দেখছি না। সে কোথায়? সে কি বাসলেহর খোঁজে শহরে গেছে?

না হয় জলা জায়গায়, লাশ হলে ভেসে উঠবে। কাকপক্ষী তাড়া করবে। শকুনের ওড়াওড়ি শুরু হবে। জলে ডুবে গেলে ফুলে ফেঁপে ভেসে উঠবেই। না, কিছুই হল না। কেউ বলল, জলে ডুবেছে না ছাই, ভেগেছে। খোঁজো নিমাইকে। কোথায় গেল নিমাই, খোঁজো তাকে। থানা-পুলিশেও বাদ গেল না। জতুকে ডেকেও জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। ভেগে যাবে তো সায়া শাড়ি ফেলে যাবে কেন? লাজলজ্জা আছে না। জতুর এক কথা, আমি জানি না, আমি কিছু জানি না।

জ্যাঠামশাই বললেন, তোর সামনেই সায়া সেমিজ খুলে ফেলল। তুই পুরুষমানুষ না! কমল তো আচ্ছা বেহায়া মেয়ে দেখছি।

জতু দেখল, মা ক্ষোভে ফুঁসছে ঘরের মধ্যে। সে তার মাকে এতটা রেগে যেতে কখনও দেখেনি। কদিন থেকে মা খেতে বসেও খেতে পারেনি। বমি উঠে আসছে। জ্যাঠামশাইর মুখের উপর মা কথা বলে না, আজ কেন যে এত রেগে গেল।

শহর থেকে নিমাইদা আর ফেরেনি। শহরে খোঁজাখুজি হয়েছে, সেখানেও সে নেই। যতীন দাস ভেজা সায়া শাড়ি তুলে নিয়ে গেছে। রোদে শুকিয়ে জায়গারটা জায়গায় রেখে

দিয়েছে! জলা জায়গার স্বভাবই এরকম, কিছুদিন উত্তেজনা–তারপর সব থিতিয়ে যায়। যতীন দাস ফের নতুন একটি বউ ঘরে তুলে এনেছে। ভুরিভোজের আয়োজন যথেষ্ট। যে খেয়েছে সেই বলেছে, বউটি বড়ো সুন্দর হে যতীন। নজর আছে তোমার!